My Parents' World - Inherited Memories

Interview with Sanchita Bhattacharyya

Interviewed by Nazmul

সঞ্চিতাঃ অনেক গল্পই শুনেছি একজন দুইজনের কাছ থেকে নয়, নানান জনের কাছ থেকে তবে তার আগে আমি একটু বলে নিতে চাইব যে ঐ ইনহেরিটেড মেমরির ব্যাপারটার সঙ্গে আমি কিভাবে রিলেট করলাম।

একদিন আমরা ক্যান্টিনে বসে আফিসে লাঞ্চের টাইমে খাবার আড্ডায় গল্প করছিলাম। নাজমুল সদ্য ঢাকা থেকে ঘুরে এসেছে এবং আমরা ওকে ঢাকার গল্প জিজ্ঞেস করছি, আমাদের অভ্যেস হচ্ছে কেউ কোথাও বেড়াতে গেলে তার কাছ থেকে গল্প শুনতে চাওয়া। তা নাজমুলকে ধরা হল যে তুমি বাংলাদেশ গিয়েছিলে কি দেখলে, লোকজন কি রকম, কি কি খেলে এ সমস্ত। ও নানান গল্প বলছে এবং কথা বলতে বলতে ও সেখানকার মানুষজনের সম্পর্কে বলছে।

সাডেনলি আমার মনে হল যে আই ওয়াজ নট দেয়ার, আমি তখন হয়তো পৌঁছে গিয়েছি আমার ছোটবেলার কোন একটা সময়ে আর ভিজুয়ালাইজ করছি যে আমার দিম্মা বড়ি দিচ্ছে, দিতে দিতে কিছু গল্প বলল। বড় মামার কথা আমার ফুল মামার সাথে কিছু কনভারসেশন আমার মেজো মামাদাদু কিছু গল্প বলেছিলেন।

আমার মেজো মামিমাদিদা আমাদের মানে পুরনো কিছু স্মৃতি খুব ছোটবেলার কিছু স্মৃতি তার সঙ্গে রিলেটেড কিছু গল্প মানে আমি হয়তো ইমাজিন করতে চেষ্টা করছিলাম যে আমার দিদিমা যে ধান ক্ষেতের গল্প বলতেন বা সব কিছুর একটা ফ্লাস সব মিলিয়ে ফর দা টাইম বিয়িং আই ওয়াজ নট দেয়ার। তারপর আবার ফিরে এলাম আড্ডায়।

তখন প্রসঙ্গক্রমে দুই চারটে গল্প হল এবং নাজমুলের মাথায় আইডিয়ার বাল্ব জ্বলে উঠলো যে গল্প বলতে হবে। তো আমার প্রথমেই একটা বড় আপত্তি ছিল যে কারণেই আমি প্রথমে এগ্রি করিনি, যে কথা বলতে চাই বলে কারণ হচ্ছে আমার এই রিফিউজি শব্দটার ব্যব্যহার নিয়ে বিশাল আপত্তি রয়েছে মানে সাম হাউ আমার এলার্জির লেভেল এই শব্দটা একজিস্ট করে আর পিছনে নানান কারণ রয়েছে কিন্তু কেন জানিনা আমি বরদাস্ত করতে পারিনা শব্দটাকে।

সো তারপরে নাজমুল আমাকে কনভিন্স করালো যে না গল্প বলতেই হবে তোমার কাছে অনেক গল্প রয়েছে, আমি ওকে একটা দুটো বলেছিলাম তখন ও বলল যে তুমি ভাবতে চেষ্টা কর।

তো ভাবছি আরো গল্প মনে পড়ছে আরো নানান কথা মনে পড়ছে রাদার এই করতে করতে একটা সময় মনে হল যে না, লিস্টে অনেক কিছুই বোধহয় রয়েছে একটু শেয়ার করা উচিত। সো হিয়ার আই অ্যাম, আমি সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, এন ইন্ডিয়ান ফ্রম দ্য সিটি কোলকাতা, ঠিক আছে।

পার্টিশন বলতে গেলে আমাকে একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে কারণ আমার পরিবারের বেসিকালি আমার মায়ের তরফের লোকজন তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমান বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে ভারতবর্ষে এসেছেন।

স্টার্টিং ফ্রম ১৯৪৬ – ১৯৪৮ এবং পার্মানেন্টলি। তার আগে কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ থেকে বর্তমান কলকাতা, মানে অবিভক্ত বাংলা সেইখানে যাতায়াতে ছিল তাদের মানে সেই অর্থে তাঁরা তাদের পার্টিশানাইট বা রিফিউজি এই শব্দগুলো তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা ঠিক কি না আমি জানি না। সেই জায়গাটায় আমার একটু চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

কিন্তু হ্যাঁ ডেফিনিটলি আমি তাদের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো শেয়ার করতে চাই।

এর মধ্যে মেইনলি এই বাংলাদেশ টু কলকাতা বা ভারতবর্ষে আসার এই যে গল্পটা তার দুটো পার্ট আছে ব্রডলি। একটা এসেছেন আমার দাদামশাই মানে আমার মায়ের বাবা, মায়ের মা তাঁরা এবং আর একটা এসেছেন আমার দিম্মার বাপের বাড়ির তরফের লোকজনেরা এবং আমার মামিমা দিদার তরফের লোকজনেরা আর কিছু আত্মীয় পরিজন।

আমার দাদুভাই, আমার মায়ের বাবা যিনি আমি শুনেছি যে তার কথা আমার স্মৃতিতে নেই, আমি যা কিছু শুনেছি মেইনলি আমি আমার দিদিমা, বড়মা, বড়মামা, মাসিমনি, এদের মুখ থেকে। আমার দাদুভাই তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ছিল সেটা নাকি অবিভক্ত বাংলা মানে এখনকার যুগের বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম, বর্মা এই এতগুলো রিজিয়ন মিলিয়ে হতো এবং এই পরীক্ষায় উনি খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। আর উনি বৃত্তি পেয়েছিলেন, স্কলারশিপ। বৃত্তি পেয়ে উনি কলকাতা পড়তে আসেন ফ্রম যশোর, যশোর জেলার নড়াই সাব-ডিভিশনে, ওনাদের গ্রামের নাম ছিল মল্লিকপুর, সেখান থেকে।

উনি আই এ পড়ার জন্য এইখানে আসেন সাম হোয়ের এরাউন্ড ১৯১২ – ১৯১৩। আমি ডেট এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না। তারপর আই এ পড়ার পরে উনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন এবং তারপরে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেন এবং পরবর্তীকালে উনি ঝরিয়ার মহারাজার এস্টাব্লিশ করা যে স্কুল এবং কলেজ ঝরিয়া রাজকলেজ, সেইখানে উনি অধ্যাপনা করতেন। এটা কিন্তু স্বাধীনতা বা ওয়ার্ল্ড ওয়ার-এর অনেক আগের কথা বলছি। দাদুভাই নিজের কাজের জায়গা ঝরিয়াতে থাকতেন এবং ছুটিতে ছুটিতে তার গ্রামের বাড়ি মল্লিকপুরে যাতায়াত করতেন। এই সময় আমার যিনি বড়মামা তিনি কিন্তু দৌলতপুর আছে খুলনা জেলায়, সেখানে কলেজে পড়াশুনা করতেন এবং আমার বড়মাসি যিনি ছিলেন তিনি খুলনা জেলা স্কুলে পড়তেন। এবং জেলা স্কুলে পড়তেন বলে তিনি আমার দিদিমার বাড়িতে সেখানে থাকতেন কারণ সেই বাড়িটা ছিল খুলনা টাউনে। দিদিমার বাবারা খুলনায়

থাকতেন, ওনাদের খুলনা টাউনে মেন বাড়ি ছিল তাছাড়া ওনাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। আমি শুনেছি সেনহাটা এবং বাগেরহাট বলে যে জায়গা আছে সেখানে এবং দে আর রিচ পিপল। কিন্তু আমার দাদুভাইরা কমপারেটিভলি ইকোনোমিক্যালি অতটা ওয়েল অফ ছিলেন না।

যেরকম আমি বললাম যে আমার দাদুভাই যাতায়াত করতেন কর্মসূত্রে এখানে থাকতেন এবং পরিবার মল্লিকপুরে থাকত। ওনাদের বাড়ির আমি ডেসক্রিপশন শুনেছি আমার দিদিমার কাছ থেকে। বাড়িটা মোটামুটি ২০ কাঠা জমির উপর ছিল, মাটির বাড়ি, সেখানে আর বাড়িতে নাকি নৌকা থাকত এইটা আমার ভীষণ অদ্ভুত লেগেছিল যে বাড়িতে কি করে নৌকা থাকতে পারে।

কিন্তু শুনলাম যে ওখানে নাকি নৌকা থাকে আর এমন বাড়ি যে বৃষ্টির সময় জল জমে যায় আর তখন নাকি নৌকা করে ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায় না, ইনফ্যাক্ট এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে গেলেও নাকি নৌকা ব্যবহার করতে হয়। আর নৌকা করেই নাকি বর্ষাকালে কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসত। সেইসব নৌকাগুলোকে নাকি গয়নার নৌকা বলা হত।

পরবর্তীকালে আমি ওই 'আমার মায়ের বাপের বাড়ি', রানী চন্দের লেখা বইটা পড়েছিলাম। তখন আমি এই নৌকা করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে যাওয়ার রেফারেন্স, নৌকার মধ্যে রান্না করার রেফারেন্সগুলো পেয়েছিলাম। এবং তখন আমি আইডেন্টিফাই করি যে আমার কাছে আমার দিদিমা যে গল্পগুলি বলছেন, একই ধরনের স্মৃতি অলরেডি ডকুমেন্টেড রয়েছে এবং আমার কাছে আমার নিজের কল্পনা মিশিয়ে সেই স্মৃতিগুলো আমি হয়ত কিছু নিজের মতন করে আত্মস্থ করেছি, এইটা একটা।

আমার দিম্মা অনেক ছোট ছোট গল্প বলতেন, তার মধ্যে একটা গল্পের কথা আমার খুব মনে পড়ে। একটা অদ্ভুত জন্তু নাকি ওখানে ছিল তার নাম নাকি হুড়াল। তো

সে প্রসঙ্গটা এইভাবে উঠেছিল যে আমার পিসতুত দাদা তাকে কুকুরে কামড়েছে তো দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন যে সেকি ইনজেকশন নিয়েছে? তো আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তখন খুব ছোট আর আমার যেহেতু মা এবং বাবা দুজনেই অফিস যেতেন সেহেতু গরমের ছুটি, শীতের ছুটি, পুজোর ছুটি এসবগুলো আমি ধানবাদ, ঝরিয়া মানে ধানবাদ জেলার ঝরিয়া সেইখানে আমার মামার বাড়িতে কাটাতাম আর আমার দিম্মার সাথে খুব ভাব ছিল। দিম্মা নানান গল্প বলতেন। সে রকমই একটা গল্প হচ্ছে হুড়ালের গল্প।

আমায় যেই হুড়াল বলেছে আমায় গল্প শুনতেই হবে তো আমি জানি না এরকম কোনো জন্তু-জানোয়ারের কথা। এখন আমার মনে হয় সেটা হয়ত কুকুর এবং নেকড়ে জাতীয় কোনো একটি প্রাণির হাইব্রিড যাকে হয়ত লোকাল ভাষায় হুড়াল বলে ডাকা হয় এবং সে নাকি ওখানকার একজন ছেলেকে কামড়ে দিয়েছিল এবং সেই ছেলেটির জলাতঙ্ক হয়। স্বাধীনতার পরের ঘটনা এবং তখন দিম্মারা ইতিমধ্যে ঝরিয়ার বাড়িতে চলে এসেছেন। এবং এরা পার্টিশন-এর পরে এসেছেন এবং খুব খারাপ অবস্থায় কলকাতার কোন একটা জায়গায় রয়েছেন এমন একটি পরিবার। চিকিৎসা করাতে পারছে না। থাকার জায়গার খুব একটা সুবিধা নেই এবং ছেলেটি ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে। তো তাকে যে আটকে রাখবে এরকম অতিরিক্ত ঘরও নেই তাদের, সেই কারণে তারা এই ছেলেটিকে নিয়ে আমার মামার বাড়িতে যান, ঝরিয়ায়, এবং সেখানে একটি অতিরিক্ত ঘরে তাকে আটকে রাখা হত। এবং যখন তার এই সমস্যাটা ট্রিগার করত তখন সে নাকি বীভৎস চিৎকার চেঁচামেচি করত, দরজা ধাক্কাত, আঁচড়াত। সেক্ষেত্রে ওনাদের কাছে খাবার নেই এবং বাচ্চাদের খেতে দিতে পারছিল না এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস।

এবং আরো একটা জিনিস হয় ঐ সময় পক্স-এর ইরাডিকেশন হয়। পক্স মানে স্মল পক্স, চিকেন পক্স নয় এবং আমাদের পরিবারে আমারই এক মামা ছোট ছিলেন আমি মণিমামা বলে ডাকি তাকে, তারও পক্স হয়েছিল এবং চিকিৎসা করাতে পারেনি। বুঝতে পারেনি বা চিকিৎসা করাতে পারেনি যে হোয়াট এভার এমন একটা অবস্থা

তৈরী হয় যে, যে কারণে ওনার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। উনি তখন ১০-১২ বছরের শিশু ছিলেন এবং এইটা বিরাট বড় সেট ব্যাক হয়েছিল তাছাড়া আরও ছোট বাচ্চারা ছিল তাদের হয়ত বার্লি খেতে দিতে হবে। জলে অসুবিধা হচ্ছে কারণ দিম্মা বলত যে মেনলি ওখানকার লোকজন পুকুর থেকে নদী থেকে জল তুলে এনে সেই জল ব্যবহার করত।

কিন্তু আমার দাদুর বাড়িতে টিউব ওয়েল ছিল, টিউব ওয়েল থেকে ওনারা জল নিয়ে জল খেতেন কিন্তু তাতেও কোনোভাবে ইনফেকশন বা কিছু অসুবিধে হওয়াতে বাড়িতে অনেক ছোট বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ফলে ওনাদের মধ্যে একটা প্যানিক তৈরী হয়, প্যানিক তৈরী হয় আরো এই কারণে যে ওনাদের জমিগুলো হঠাৎ করে দখল হয়ে যায়, কে বা কারা এবং তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

ফলে কি হয়, যে বাড়িতে যে সম্বৎসরের ধান, চাল এগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পড়ে ওনারা প্যানিকড হয়ে পড়েন, যে আমাদের কষ্টটা একরকম কিন্তু আমার বাচ্চাদের খেতে দিতে পারছি না এবং এই ফিলিংটা থেকে ওনারা মনে করেন যে ফর দ্য টাইম বিয়িং টালমাটালের অসুবিধে ডামাডোলের বাজারে। ইতিমধ্যে তো ঝরিয়া তে আমার দাদু রয়েছেন, সেখানে কিছুদিন গিয়ে থাকা যাক না। তারপর গণ্ডগোল শান্ত হলে, পরিস্থিতি শান্ত হলে ফেরত আসা যাবে। সেই জন্য একটা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট হিসাবে দাদুভাই যান এবং উনি বাড়ির লোকদের নিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসার মধ্যে আমি যতদূর শুনেছি তাতে আমার মায়ের যিনি পিসিমার পরিবার ছিলেন তিনি সেই সময়ে আসতে চাননি।

তারা বলেন যে তাদের এনসেসট্রার মানে তার শ্বশুর বাড়ির যে জায়গা সেখানে পৌঁছে দিতে। বাচ্চাদের সমেত মায়ের পিসিমাকে ওখানে প্রথমে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তারপর আমার দাদুভাই একটি নৌকা হায়ার করেন এবং সেই নৌকাতেই নিজের পরিবারবর্গ মানে আমার দিম্মা, দাদুভায়ের-মা এবং বাচ্চারা যারা তাদের নিয়ে উনি যশোরের লঞ্চঘাটের দিকে রওনা দেন এবং লঞ্চঘাটে যাওয়ার আগে ইতনা বলে

একটি জায়গা পড়ত সেইখানে আসতে হবে। এবং মল্লিকপুরের গ্রামের বাড়ি থেকে ইতনা যেতে যেতে এই জায়গাতে ওনারা একটা ছোট নৌকাতে করে যান। এবং নৌকাতে যখন চড়েন, তখন শুনেছি যে মামারা নৌকার মধ্যেই বসে খেলা করছে, এ জিনিসে হাত দিচ্ছে, পাটাতন তুলে কি রয়েছে এবং দেখতে পেয়েছে যে কতগুলি দা, কাটারি এই সমস্ত রয়েছে এবং তারই মধ্যে আমার রাঙা মামা শুনতে পেয়েছেন যে, একজন মাঝি আর একজন মাঝির সাথে ঝগড়া করছে গয়নার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। কারণ তারা আমার দাদুভাইকে চিনতেন এবং তারা জানতেন যে আমার দিদিমার বাপের বাড়ি বর্ধিষ্ণু পরিবার, তাদের অনেক সম্পত্তি রয়েছে, ফলে তারা হয়ত আইডিয়া করেছিলেন যে এরা গয়না নিয়ে চলে যাচ্ছে। হয়ত পার্মানেন্টলি যাচ্ছে না, কিন্তু এদের সঙ্গে ভ্যালুয়েবলস রয়েছে। এই আইডিয়াটা মাঝি ভাইদের ছিল এবং তারা মেরে কে কতটা নেবে, কে কতটা ভাগ পাবে এই আলোচনা করছিল, এইটা আমার রাঙা মামা শুনতে পান আর রাঙা মামা মাসিমনি ডিসকাস করেন সেটা দাদুকে বলে দেন। তখন বাচ্চারাই আর কি, মানে রাঙা মামা আর মাসিমনি দুজনে মিলে ঐ পাটাতনের তলা থেকে থলিটা বার করে দা গুলো, কাটারিগুলো আস্তে আস্তে জলে ছেড়ে দেন এবং কিছু দূরে যাওয়ার পড়ে যখন ওদের ঝগড়ার মীমাংসা হয়, তারা যখন জিনিসগুলো খুঁজতে আসেন এবং তারা কিছুই পায় না। তখন প্রচণ্ড বকাবকি করেছেন। যে এই তোমরা এখানে কেন? আমাদের দামী জিনিস রয়েছে। এই রয়েছে, ঐ রয়েছে, তোমরা কেন হাত দিয়েছ, এইখানে কেন খেলা করছ? তারা বলছে যে এইটুকু তো নৌকা, একপাশে বসেছিলাম, এই পাশে এসেছি, কি করব জানি না, আমরা জানি না। কিন্তু সেটা একটা বিপদ, তার হাত থেকে বেরিয়ে যান এবং তারপর ইতনা বলে যে জায়গাটি আসে সেই জায়গাটি তে দাদুভাই এই নৌকাটিকে ছেড়ে দেন, এবং ছেড়ে দিয়ে একটি গয়নার নৌকা হায়ার করেন। গয়নার নৌকায় বা আমার দিম্মা বলেছেন যে গয়নার নৌকাতে করে জিনিসপত্র যাতায়াত করত। বেসিক্যালি, মালবাহী নৌকা। বড়। আকারে বড়, তাতে পণ্য পরিবহণের কাজে লাগে বলে যদি মানুষ উঠে তাহলে হয়ত ছোট নৌকাতে যতজন মানুষ আঁটবেন তার চেয়ে হয়ত গয়নার নৌকা করে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করতে পারেন। দাদুভাই-দিম্মারা সবাইকে নিয়ে যশোরের লঞ্চঘাটে আসেন, সেখান থেকে লঞ্চ ধরে

নদী পার হন এবং দে কেম টু বসিরহাট। তারপর এখানে কোথাও হয়ত লঞ্চঘাট থেকে নদী পার হওয়ার পরেই ট্রেনে উঠেছিলেন বা বসিরহাট থেকে ট্রেন ধরেছিলেন। কিন্তু ভায়া শিয়ালদা ঝরিয়াতে গিয়ে পৌছেছিলেন। ঝরিয়া পৌঁছবার পরেই কিন্তু আমাদের ১৯৪৬ কলকাতা রায়ট তার আগেই কিন্তু অলরেডি সেফলি বাংলাদেশ বর্তমান বাংলাদেশ টু ঝরিয়া পৌঁছে গেছেন।

এবার ঝরিয়ায় পৌঁছে গিয়ে একটা সেট ব্যাক হল। বলা যেতে পারে এত বড় বাড়ি, মাঠ, ধান জমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটা ভাড়া বাড়ি, সেখানে এতগুলো লোক, বাট দে হ্যাভ অ্যাডাপটেড। আমার বড় মামা আমাকে এই বলতেন যে ইউ স্যুড নট বি ড্রুলিং আপন দ্য পাস্ট। পিছনে যা কিছুই দেখছো, চেষ্টা করো এগিয়ে যেতে। হয়ত এটাকেই লাইফ ফোর্স বলে বা স্ট্রাগল অ্যাগেনস্ট লাইফ। সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার যে লড়াই। পার্টিশন হয়তো তাদের চরম শিক্ষাটা দিয়েছে। ১৯৪৬-এ তো দিদিমারা এখানে এলেন।

এইখানে একদম অন্যরকম পরিবেশ। ধানবাদ, ঝরিয়া কয়লা খনি এরিয়া সেখানে প্রচুর বাঙালি রয়েছে, আজকের ডেটেও। অসংখ্য বাঙালি সেখানে কর্মসূত্রে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য রয়েছেন এবং সম সময়েও থাকতেন এবং নর্থ ইন্ডিয়ার যে স্পাইস মার্কেট সেটা কিন্তু ঝড়িয়ার মধ্যা দিয়ে যায়, ফলে, ওটা একটা বাজার এরিয়া এবং খুব ছোট কিন্তু জনবহুল এরিয়া। ওখানে কোনো ধরনের রায়টের আঁচ বা সামাজিক অসুবিধে সেগুলো ফেস করেননি। কিন্তু ওখানে গিয়ে প্রবলেমটা অন্য রকমের হল। ওখানে আমি বড় মামার কাছ থেকে মেইনলি একটা ডাকাতির গল্প শুনেছি এবং সেটা একটা অদ্ভুতভাবে। বড় মামা মাঝে মাঝে কলকাতায় কাজে আসতেন। আমার মামাবাড়ি হচ্ছে সুকিয়া স্ট্রিট। তো আমাদের বাড়িতে থাকতেন। আমাদের বাড়ি থেকে কলকাতার যে কোনো দিকে যাতায়াত করাটা খুব সুবিধেজনক, খুব সেন্ট্রাল একটা জায়গা, এবং কমিউনিকেশনের পার্স্পেক্টিভে দেখতে গেলে বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করা আমাদের বাড়ি থেকে খুব সুবিধে। তো আমাদের কাছে থাকতেন এবং বড় মামা সিগারেট খেতেন কিন্তু বাড়িতে বড়রা থাকলে তো খেতেন-ই না, মেয়েরা

থাকলেও খেতেন না। ইনফ্যাক্ট বাচ্চাদের সামনেও বাড়ির ভিতরে খেতেন না, বাড়ির বাইরে, এইটা একটা অদ্ভুত ওনার নেচার ছিল। আমার পিসিমা, আমার জ্যেঠুরা বলাবলি করতেন এরা তো বাঙ্গাল ঐ জন্য এদের এরকম কাণ্ড। কারণ আমার বাবারা চিরকালই বর্তমান ভারতবর্ষের বাসিন্দা। ঐ বাঙালের কনসেপ্ট নেই। ইনফ্যাক্ট, আমার বাড়িতে আমি কখনো বাঙাল-ঘটি এব্যাপারটা শুনিনি কারণ আমি মিক্সড।

তো এই বড়মামা আসতেন। একদিন বড়মামার সঙ্গে পায়চারি করতে বেরিয়েছি। বড়মামা বাটা থেকে হাওয়াই চটি কিনবে। আমার বাড়ির কাছেই মানিকতলার বাটা। বিকেলে দুজনে বেরিয়েছি। তো তখন আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমি ক্রাইম ওয়ার্ল্ড সিরিজের গল্প পড়তাম। অয়স্কান্ত বক্সি, ন্যাটার ইন্টেলিজেন্স, গল্পের বই, তাতে লাঠি হাতে দস্যুর ছবি, অমুক, তমুক, তারপরেই ছোটখাট ডাকাতের গল্প পড়েছি। তো বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন দস্যু মোহনের গল্প পড়েছ? তা আমি বললাম, না তো। মামা বললেন, এ কি! দস্যু মোহনের গল্প না পড়লে নাকি আমার জীবন বৃথা। কী হবে এই সমস্ত গোয়েন্দা গল্প পড়ে? আর ক্রাইম ওয়ার্ল্ড সিরিজ পড়ে?

দস্যু মোহন না পড়লে তুমি বাঙালি নও। তাহলে!! আমার তো নেই। ঠিক আছে, আমি তোমায় এনে দেব। নেক্সট ভিজিটে উনি আমার একটা দস্যু মোহনের গল্পের বই এনে দিলেন। আমি পড়লাম। পড়ার পর আমার নানা প্রশ্ন। আবার ঐরকম একদিন বেরিয়েছি বড়মামার সঙ্গে। তখন বড়মামা আমার বলল ঐ ডাকাতির ইভেন্ট। আমার দিম্মার সঙ্গে দ্যাট কাম ফ্রম নাও বাংলাদেশ টু নাও ইন্ডিয়া। সেটা হচ্ছে এই ১৯৪৬-এর ঝরিয়া আসে পৌঁছবার পড়ে ওখানকার লোকজনদের নতুন তখন কিন্তু রিফিউজি সো কল্ড কারণ ..... আসা ফর্মালি শুরু হয়নি। ভারতবর্ষে এবং স্প্রেড আউট করা এটাও সেরকম ম্যাসিভলি শুরু হয়নি ফলে ঝরিয়া ওই ছোট কোলিয়ারির বাড়ির আশেপাশে যারা থাকতেন তাদের কাছেও অবাক লাগত যে একটা বাড়ি তারা করবি নানে, যাবি, নানে, খাবি নানে করে কথা বলে।

দুধওয়ালার সাথে আমার দিম্মার কনভারসেশন মনে পড়ে। আমার দিম্মা এরকম তার করবি নানে যাবি নানে খাবই নানে তার ভাষায় কথা বলে চলেছে আর দুধওয়ালা তার দেশোয়ালি হিন্দি মাজি গামলা লাইয়ে এরম অদ্ভুত ভাবে দুই জন দুজনার সাথে কমিউনিকেশন করে চলে এবং দুজনা দুজনার কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর একটা ব্যাপার আমার দিদিমার লজিক ছিল ওকে যদি আমি টাকা পয়সার হিসাব বলি তাহলে বোঝে কিন্তু আমি যখন বলি এটা কম দিচ্ছ এটা বেশি দিচ্ছ, তখন ও আর বুঝতে পারে না। এটা ওর ইচ্ছাকৃত। ও সব ভাষা বোঝে কিন্তু আমার সঙ্গে বলবে না এইটা ষড়যন্ত্র। কারণ সে দিম্মা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। সেইজন্য সে তাকে পছন্দ করে না। তাই নাকি সে এইসব ট্রিক প্লে করে। যাই হোক।

কোনভাবে দ্যা নিউজ ওয়াজ আউট যে এদের সঙ্গে অনেক জায়গা আছে। এবং সত্যিকারেরও ছিল এবং অলমোস্ট ১৫০ ভরি থেকেও বেশি শুধু আসার দিদিমারই ছিল। এবং বাড়িতে ডাকাত পড়ে। বাড়ির সামনেই নাকি পুলিশ চৌকি ছিল এবং ডাকাতি হচ্ছে সেই সময় দৌড়ে গিয়ে সেখানে খবরও দেওয়া হয় এবং তারা নাকি ভাগিয়ে দেয় লোকজনকে। কি বলছ দুপুরবেলায় ডাকাতি হচ্ছে। আমরা দুপুরবেলায় বসে আছি মামদোবাজি নাকি? এসব হিন্দিতে কনভারসেশন হচ্ছে কিন্তু ছোট যারা ছিলেন তারা বলতে গিয়েছিলেন তাদের ভাগিয়ে দেওয়া হয় এবং ডাকাত সর্বস্ব নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে ভাল জামাকাপড়, ভাল বাসনকোসন যা পেয়েছে সবই নিয়ে গেছে।

দাদুভাই হঠাৎ করে যে কোনো কারণেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং ডাকাতদের মধ্যে একজনকে জাপটে ধরেন এবং দুজনার মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। আর ওখানকার বাড়িগুলো না দেখলে পরে এগুলো ঠিক আমার পক্ষে বোঝানো মুশকিল।

বাড়িতে অনেক লোক থাকলে যা হয় বিছানা গাদা দিয়ে বোঝাই করা ঘর। আমি এগুলো দেখেছি কিন্তু যারা দেখেনি তাদের জন্য বলছি একটা বিছানার গাদা বোঝাই করা ঘর সেইখানে তোশক, বালিশ এরকম মাটি থেকে অলমোস্ট ছাদ পর্যন্ত হাইটে

জড় করা আছে। এরকম একাধিক রো এন্ড কলমস এবং হাতাহাতি হতে হতে তারা ঐওখানটায় গিয়ে পড়েন এবং কোনোভাবে একটা মশারীর সঙ্গে জড়িয়ে যায় দুজন। ডাকাত এবং দাদুভাই। এবং ডাকাতরা তখন তাদের হাতের ঐ তলোয়ার গোছের কিছু ছিল, বড় তলোয়ার বা চপার। সেটা দিয়ে কুপিয়ে মারতে চেষ্টা করে কিন্তু দাদুভাইও রোল করে গেছে মশারিটার সাথে। ডাকাত ও রোল করে গেছে। মনে ডাকাতও আহত এবং দাদুভাইও আহত। এবং একটা সময়ের পর উনি আর ফাইট করতে পারলেন না তখন ডাকাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল এবং দাদুভাই প্রচণ্ড ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দীর্ঘদিন মানে চিকিৎসার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আবার কাজ করা শুরু করলেন এরকম ছোটখাটো কিছু ঘটনা, তার মধ্যে আমার দিম্মা কতকগুলো কথা বলতো। যেমন একবার হল আমি আমার এক বন্ধুর ঠাকুমার গল্প করলাম উনি খুব ভালো পিঠে বানিয়েছিলেন তা আমি পরের বার মামাবাড়ি গিয়ে বললাম যে দিম্মা আমি পিঠে খেয়েছি এর নাম নাকি পাটিসাপটা? দিম্মা তখন আরো নানান পিঠের গল্প বলল। আমি বললাম লুসি পিঠে কি জিনিস? ব্যস শুরু হয়ে গেল বিকেলবেলা থেকেই মাসিমনি চলে এল, নারকোল কোরানো হল, লুসি পিঠে তৈরী হল। তখন নানান পিঠের ভ্যারাইটি, এটা একটা, তারপর আমার

দিম্মা আমায় বললেন যে জানিসতো ঢাকার মহিলারা না খুব গুনের হয়। কিরকম? বলল তারা খুব ভালো হাতের কাজ জানে, জেনেরেলি দেখা যায় গান করতে জানেন মানেএকটু শিল্পসংস্কৃতির ধার ঘেঁষা এবং খুব এডুকেটেড সফিসটিকেটেড। আমি বললাম আচ্ছা আকচ্যুয়ালি আমার কাছে না ব্যাপারগুলি একটু অন্যরকমভাবে আসে, আমি খুব ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে আমার বাড়ীতে টেলিভিশন আছে, আমার মানে যখন থেকে আমার জ্ঞান হচ্ছে বুঝতে শিখছি আমার বাড়িতে টেলিভিশন রয়েছে এবং মাঝে মধ্যে একদল লোকজন আসে যারা দুপুরবেলা অফিস কেটে, মানে অফিসের

খাতায় সই করে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এবং আমার মাকে নানান খাবার নানান খাবারের ফিরিস্থি দেয়।

আমার মাও অফিস থেকে এসে তারা যাতে খেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে এবং তারা বিভৎস গোলমাল করে কিনা কি ফুটবল খেলা হচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান। আমার বাবা মোহনবাগান এবং যতজন খেলা দেখতে আসে সবাই ইস্টবেঙ্গল এবং তারা আমাদেরই বাড়িতে এসে ঘুগনি, পায়েস, পাউরুটি টোস্ট, ডিমের অমলেট কেউ ডিম সিদ্ধ নানান ফিরিস্তি কেউ আবার বলে গেল লুচি আলুর দম খাব এবং বলে যেত বৌদি অমুক দিন খেলা আছে. এইটা একটা

আমি খুব ছোট ছিলাম তখন, যখনই খেলা চলত আমি বুঝতে পারতাম না কি হচ্ছে, মানে বিভৎস গোলমাল একটা ছোটঘর আমরা একান্নবর্তি পরিবারে থাকতাম।মানে ছোট একটা ঘর আমাদের শোয়ার ঘরেই টেলিভিসন, কোনারক এর সুপ্রিম টেলিভিসন এবং সাটার টেনে খুলতে বন্ধ করতে হত সাদা কালো।এবং তারা আসতেন খেলার দিনই আসতেন

এবং সারাদিন থাকতেন, এবং আমাকে ছোট বলে দয়া করে খাটের কোনে একটু জায়গা দেওয়া হত।আর হাফ-টাইমের পরে দেখা যেত মা বাবা এবং আমি, আমরা তিনজনেই ঘর কেন, ঘরের সংলগ্ন যে চাতাল বলি আমরা যেখানে খাবার টেবিল ছিল সেই জায়গাটাতেও আমাদের জায়গা হয়নি।আমারা আমাদের ঘর সংলগ্ন ছোট ছাদে কিম্বা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং ঘরের মধ্যে মানে বিপুল বিক্রমে কয়েকজন মানুষ এ ওর সাথে ঝগড়া করছে নানা রকম কে কেন গোল দিতে পারল না এইসব হচ্ছে, এইটা আমার কাছে খুব ইনটারেসটিং লেগেছিল কারণ এরা সকলেই হচ্ছে বাঙ্গাল কিন্তু আমার বাড়ি যেটা সেটা হচ্ছে ঘটি, তখনও কিন্তু আমি বুঝতাম না,

হোয়াট ইজ বাঙ্গাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ ঘটি, আর কেন আমাকেই বা ঘটি বলা হবে, আর আমার মাকেই বা বাঙ্গাল বলা হবে আর বাবাকেই বা কেন ঘটি বলা হবে?

বাংলাদেশে গানের অনুষ্ঠান হত, একটু লেট নাইটে। ঐ সময়ে ৮৪/৮৫ এইরকম সময় তার ট্রান্সমিশন আমাদের এখানে ধরা পড়ত, যদি কারও বাড়িতে বড় এন্টেনা থাকতো তো আমাদের টিভিতে সেই গানের অনুষ্ঠান ধরা পরত এবং আমাদের পাড়ারও অনেকে শুনতে আসতো এবং খুব ভাল। এবং প্রাইভেসি বলে যে জিনিসটা, যেটা নিয়ে আজকে আমরা এত মারামারি করি, এই আমার প্রাইভেসি হেম্পারড হচ্ছে। প্রাইভেসির কোন কনসেপ্টই নেই। কারোর বাড়িতে দূর থেকে ট্রাঙ্ক কল আসবে, মাঝরাতে দরজা ঠকঠক করে উঠিয়ে দেওয়া হল। কেউ গান শুনতে আসবে ঠকঠক করে উঠিয়ে দেওয়া হল, ইন্ডিয়া পাকিস্তান এর ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, ঘুমের তো কোন ব্যাপারই নেই, তুমি উঠে যাও, সিঁড়িতে ঘুমোও, কিন্তু খেলা চলবে, এইরকম। এইরকম ছোট ছোট দু-একটা জিনিস। তারপরে প্রথম যখন বাঙ্গাল ঘটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম সেটার মাঝেও আর একটা ছোটগল্প আছে।

আমি বহরমপুর গিয়েছিলাম বহরমপুরে আমার রাঙ্গা মাসির বাড়ি, সেখানে দিদিদের সঙ্গে, তারপরে দিদিদের কাজিনদের সঙ্গে আসেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তো একজনাদের বাড়িতে যায়, সেই বাড়ির যিনি দিদা তিনি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তিনি আচার বানাছিলেন, আমাদের লোভ লেগেছে। যেই ডেকেছে চলে গেছি, তো যেতেই আমাদের বলেছে, আয় বয়, তো আমরা বুঝতে পারিনি আবার উনি বলেছেন, আয় বয়। তখন আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিল, সে বলছে যে আমিতো গার্ল আমাকে বয় কেন বলছে? হাসি....

এবং মানে আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, সঙ্গে আমার দিদি ছিল, সে কভার আপ করল বলল যে বসতে বলছে, বসতে বলছে, বসলে আচার দেবে। আমরা সাট

দিয়ে বসে পরলাম। কিসের একটা আচার দিল আমের না কিসের আমার মনে নেই। আচার হাতে করে আমারা আচার খেতে খেতে বাড়ি ফেরত চলে এলাম। বাড়িতে ঢুকতেই আমার রাঙ্গা মাসির শ্বশুর বাড়ির তরফের লোকজনেরা বলল, তোরা কোথায় গিয়েছিলে? আচার নিয়ে এতগুলো বাচ্ছা। তো আমরা বললাম যে আমরা এই এই জায়গা গিয়েছিলাম এই এই গলি দিয়ে এই গলি দিয়ে বলল যে ঐ বাড়িতে গেলি কেন? ও তো বাঙালদের বাড়ি। তারা কট্টর ঘটি। আমি বললাম, বাঙাল কি? আর ঘটিই বা কি? বুঝিনা? বাড়ি এসে বাবাকে বললাম, বাবাকে বলার পর, বাবা আমাকে একটা খুব মজার কথা বলল, বলল যে তোকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তুই কি? তুই কি বলবি? কি বলব, জানিনা, আমি তো বুঝতে পারছি না। বলল তুই বলবি আমি বাটি। বাঙাল থেকে বা আর ঘটির টি কাজেই কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না।

এইটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স যে যেখানে আমি শুনলাম, শিখলাম তারপরই হল, হ্যালির ধুমকেতু এল ১৯৮৬ ইফ আই এম নট মিসটেকন, সায়েন্স কলেজের ছাদে টেলিসকোপ ফিট করা হয়েছে।

আমার মা এবং বাবা দুজনারই তখন সায়েন্স কলেজে পোস্টিং। এবং টেলিস্কোপ ফিট করা তো একটা মজার গল্প। কোনদিন আমারা মঙ্গল গ্রহ দেখছি, কোনদিন শুক্র গ্রহ দেখছি, কোনদিন শনির বলয় দেখছি কিন্তু হেলির ধূমকেতুর লেজও দেখতে পাচ্ছি না। তো প্রথম দিনের প্রচেষ্টা মাটিতে, সেকেন্ড দিন সবাই বলল যে না না এরম করে হবে না।ভালো খাওয়ার দাওয়ার আয়োজন করতে হবে, তা নাহলে টেলিস্কোপও কথা শুনবে না। তখন ভার পড়ল কিছু লোকের উপর রান্না করার। তার মধ্যে আমার মা একজন কারণ আমার মা ভাল রান্না করেন। এবং বেছে বেছে ভার দেওয়া হল এমন লোকের উপরেই যাদের ওরিজিন হচ্ছে "ওপার বাংলায়"। আমার মাও রান্না করে নিয়ে গেল, সেদিন রাত্রে আমাদেরও টার্ম এলো, হেলি ধূমকেতু

দেখার। আমারা সারারাত জেগে হই, হাল্লা করলাম এবং যে যাকিছু খাবার রান্না করে এনেছে, বিভিন্ন আইটেম – আলুর দম, পোস্ত, কুমড়োর ছক্কা, মাংস, পাঠার মাংস, মুরগীর মাংস। আরও কত কি মানে খেয়ে শেষ করা যাবে না। তো অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স ছিল। এ পি সি রোড, আমার বাড়ির সামনেই দিয়ে, আমার বাড়ির পাশেই সায়েন্স কলেজ, রাজাবাজার ছাদে উঠেছি নিঃশব্দ মনে হচ্ছে কোন হিল স্টেশন, এত পরিষ্কার রাস্তাটা লাগে, রাত্রি বেলায় উপর থেকে। ওইটা আমি দেখেছিলাম আর তখন শুনেছিলাম এত ভালো ভালো রান্না কেন জান? এরা সবাই বাঙাল। খাচ্ছে, তারিফ করছে, কিন্তু খোটা দিতে ছাড়ছে না। আস্তে আস্তে এইসব জিনিসগুলো দেখলাম কিন্তু আমার বাড়িতে কোনদিন ছিল না, এইগুলো, আমাকে কখনো বলা হয়নি আর টকিং এবাউট দ্যা টার্ম রেফুজি। আমার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন, আমার ঠাকুরদাদা রামদেব স্মৃতিতীর্থ, তিনি তার বাবার হাত ধরে ভাট পাড়া নৈহাটির কাছে জায়গাটা, সেখান থেকে কলকাতা এসেছিলেন বহু বছর আগে। মানে আমার বাবার ঠাকুরদাদা, তাহলে কি আমারাও রেফুজি, তালে রেফুজি শব্দটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, আর কার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ডিবেটটা পরবর্তী কালে আমার দাদুভায়ের একটা কথা শুনে মনে এসেছিল, আমি জানিনা এইটা হয়ত একটু কনট্রোভারসিয়াল, বলা ঠিক হচ্ছে কিনা, আমার তাও আমি মনে করছি আমি বলি, কারণ আমি জিনিসগুলোকে এইভাবে দেখি -

আমার বাবার ঠাকুরদাদা নৈহাটির একটা জায়গা থেকে তার ছেলেকে নিয়ে কলকাতা এলেন, অনেকদূর অনেক কষ্ট করে এলেন পায়ে হেঁটে, অনেক স্ট্রাগল করলেন, এখানে ছেলেকে লেখাপড়া, শেখালেন এস্টাবলিস করলেন, বাড়ি বানালেন। থাকলেন। তারপর কলকাতা হল। তখন নাকি মানিকতলা চত্বরে হোগলা বন ছিল, তাহলে এটাও একটা রিমোট জায়গা, উনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে অনেকদূরে, জায়গাটার সঙ্গে উনি বা ওনার অ্যানসিস্টট্রাল ওরিজিন যারা, যাদের

সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তারাও মাইগ্রেট করেছে এবং আমার দাদুভাই আমার মেজ মামাদাদু, এবং আমার মামিমাদিদা, আমার দিম্মা এরাও মাইগ্রেট করেছে।

আমার দাদুভাই কোনোদিন রেফুজি কার্ড করাননি, এই যে ল্যান্ড এক্সচেঞ্জ হয়েছে সেগুলো উনি কোনোদিন ক্লেম করতে যাননি। কারণ ওনার বক্তব্য ছিল, আমি একজন স্বাধীন ভারতের, স্বাধীন নাগরিক। আমি ১৯৪৭ এর আগে কোন একটা সময়, আমারই দেশের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে এসেছি। আমার পরিবারকে নিয়ে, তাহলে আজকে কেন আমাকে রেফুজি বলা হবে? আমি কি রেফুজি? উনি যদি রেফুজি না হন, তাহলে আমার ঠাকুরদাদা, শুধুমাত্র তিনি কেন রেফুজি নন। তিনিও তো এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গাতে মাইগ্রেট করেছেন। ডায়াসপোরার বাঙ্গালি আমরা বলে থাকি, তাই না। তিনি তো জীবিকা নির্বাহের জন্যে এসেছিলেন। তিনিও তো ওখানে থাকতে পারছিলেন না, ওনার কষ্ট হচ্ছিল। ফোসড মাইগ্রেশন কোন না কোনও কারণে। দুজনার মধ্যে আপনি কাকে রেফুজি বলবেন? এটাতো প্রশ্ন, আমার কাছে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। কাজেই এই রিফুজি টার্মটায় আমার আপত্তি।

পার্টিশন উইটনেস করেছেন এরকম মানুষের সাক্সেসর আমি, কিন্তু রিফুজি আইডেনটিটিটা মানতে রাজি নই।

এতদিন হয়ে গেল পার্টিশন ১৯৪৭ থেকে আজ ২০১৫। এতদিন পরে এই ভারত পশ্চিমবাংলা, পূর্ববাংলা, বাংলাদেশ এখন বর্তমানে, এই পার্টিশনটা আপনার জীবনে কি অর্থ বহন করে?

সত্যি কথা বলতে কি কোন অর্থ বহন করে না। দিস ইজ অল এবাউট মেমোরিজ, মেমোরিজ অফ মাই এন্সিসস্টার আমার দাদু, দিদা, আমার পরিবারের আত্মীয় স্বজন, তাদের তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের ফিলিংস এবং আমার ফিলিংস ফর দেম, দা ওয়ে

আই ফিল ফর দেম। তাদের ভালোলাগা, তাদের ভালবাসা। সেগুলো দিয়ে আমার ভালো লাগা, আমার ভালবাসা কন্ডিশনড হচ্ছে।

ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ হয়, পাকিস্তান জেতে, পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নিয়ে রাজাবাজারে বাজি-পটকা পোড়ানো হয়, আমার খারাপ লাগে। কিন্তু বাংলাদেশও তো ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে ক্রিকেট ম্যচ জেতে কেউ তো ফ্ল্যাগ তোলে না, কেউ তো বাজি পোড়ায় না। ইনফেক্ট একটা ছোট্ট জিনিস, হয়তো অপ্রাসঙ্গিক এইখানে আমার এইটা অভ্যেস যে কেউ কোথাও বেড়াতে গেলে জিজ্ঞেস করি।আমি আমার মেজোমামি মামাদাদু, মামিমা দাদা তাদের কথাগুলোও বলব তাদের এক্সপেরিয়েন্স কাছ থেকে আমি কি শুনেছি তাদের যিনি মেয়ে, তাদের একজন আমার মাসি। সে মাসিরা বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন।তারা সারা পৃথিবী ঘুরে বেরান চাইনা গেছেন, ইজিপ্ট গেছেন, আমেরিকা গেছেন, বাংলাদেশও গেছেন এবং ঘুরে এসে দুটো জিনিস, দুটো কথা আমার স্ট্রাইকিং লেগেছে উনাদের কাছ থেকে শুনে, যে বাংলাদেশ খোলা বাজারে লিকার বিক্রি হয় না, আর কোন ব্রথেল নেই প্রস্টটিটুসন নেই। বিইং এ ওমেন আই ফিল প্রাউড ফর দ্যাট কান্ট্রি, অ্যান্ড লুক অ্যাট দা রেসিও অফ রেপ। আজকে, এইগুলো আমাদের সামাজিক সমস্যা আপনি ইস্ট এশিয়া বা সাউথ ইস্ট এশিয়া যে কোন দেশের কথায় বলেন না কেন, এইগুলো তো প্রব্লেম, তাই না? একটা দেশ যদি সেটা, ছোট্ট একটা দেশ তারা যদি এইটা ওভারকাম করতে পারে তাহলে আমরা তাদের থেকে ভাল জিনিসটা শিখব না কেন? একই জায়গায় আমার অন্য এক মাসি ইসলামাবাদে যে গুলি চালানো হল স্কুলে তার কিছুদিন আগে উনি লাহোর-ইসলামাবাদ করাচি গিয়েছিলেন, এক মাসের উপরে ছিলেন, উনার কাছ থেকেও আমি নানান কথা শুনেছি কিন্তু পাকিস্তান বলে আমার মনে হয় এমন একটা দেশ যে আমার দেশে টেরোরিস্ট অ্যাটাক করাচ্ছে, বোমা ফাটাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ বলে সেটা মনে হচ্ছে

না।হতে পারে সেটা ভাষার জন্যে বা হতে পারে সেটা আমার পূর্ব-পুরুষ ওই দেশটাকে ভালবাসত বলে, আমি জানিনা এটা কি?

নাজমুলঃ এই ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার, এই বর্ডারটাকে তুমি কিভাবে দেখ, মানে একসময় আমরা এক ছিলাম এখন ফিজিকালি ওর মধ্যে একটা বর্ডার এসেছে আমরা দুই দেশ –

সঞ্চিতাঃ বর্ডার বললেই, চোখ বন্ধ করলেই, আমার চোখের সামনে ওয়াগা বর্ডারের ছবিটা ভেসে উঠে। মাথায় টুপি পরা, হাতে বন্দুকধারী সান্ত্রিরা দাঁড়িয়ে আছে, একটা বড় গেট, কাঁটা তার।কিন্তু বর্ডার মানে কি তাই? আমি এখানে একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই।জান, আমি না আইলা হয়েছিল ২০০৯ সালে, আইলার সময় ত্রান নিয়ে সুন্দরবন গিয়েছিলাম।

এই আমাদের সায়েন্স সিটির পাশে যে রাস্তাটা দিয়ে, মালঞ্চ হয়ে, ধামাখালি ব্লক-টু, সেখানে গিয়ে ডি এমের সঙ্গে কথা বলা হল এবং বলে ডি এম এর নৌকো করে আমরা হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে একটা জায়গা গেলাম, সেটা সেই, সেই সময় কারণ ওদের আইলার পরে মেপটা চেঞ্জ হয়েগেছে, মানে লোকেশন, দ্বীপগুলোর যে লোকেশনগুলো, জিওগ্রাফিকাল লোকেশগুলো প্র্যাক্টিকালি সিফট করেগেছে, কারণ উপনদি, শাখানদিগুলো এমনভাবে একে অপরের সাথে মিশে গেছে এবং ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে যে, পুরো ডেমোগ্রাফিটাই পাল্টে গেছে এবং ম্যাপগুলো আর ল্যান্ডমার্কগুলো

আর নেই একজিস্ট করেনা। হয়তো একটা কোন দ্বীপ দু'কিলোমিটার সিফট করে গেছে।

আমরা যে জায়গাটাতে গিয়ে নামলাম, সেই জায়গাটা আমরা হিঙ্গলগঞ্জ থেকে অলমোস্ট দু'ঘন্টা ঐ ডিএম এর লঞ্চে করে গিয়েছিলাম।আমাদের সঙ্গে প্রচুর চাল প্রায় ৫০০ কেজি চাল, ২০০ কেজি ডাল প্রচুর জলের বোতল, বিস্কিটের প্যাকেট, কিছু জামাকাপড় এইসব ছিল।তো ডিএম যিনি মিস্টার মন্ডল ছিলেন তখন, উনি আমাদের বললেন যে তোমরা এতটা জিনিস এনেছ এবং আমাদের আমরা পাঁচজন মিলে গিয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেরা বন্ধু-বান্ধবরা মিলে ফান্ড রেজ করে এই সমস্ত জিনিস কিনে দুটো টাটা সুমো বোঝাই করে নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম এবং আমাদের আইডিয়াটাই এটা ছিল যে আমরা কারোও হাতে দেব না। আমরা ডিরিক্টলি যারা এফেক্টেড তাদের হাতে দিব।আমরা জুলাই মাস নাগাদ গিয়েছিলাম তখন আইলার লেশটা অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু যাওয়ার সময় দেখলাম পথে এই যে ত্রাণ যাচ্ছে।ত্রাণগুলো বিক্রি হচ্ছে পাঁচ টাকা করে শার্ট, টুপি, মোজা, ঐ বিস্কুটের প্যাকেটগুলিই বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যেতে যেতে আমাদের ধারণাগুলো বদ্ধমূল হল যে আমরা যা ডিসিসন নিয়েছি ঠিক করেছি। যেতে যেতে আমাদের ধারণাগুলো বদ্ধমূল হল যে আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঠিক করেছি আমরা সোজা ডি এম এর কাছে গেলাম, ডি এম একটা লজে অস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন কারণ উনার যে ডি এম এর অফিস যা পুলিশ থানা সেগুলো অলরেডি জলের তলায় চলে গেছে।উনি ঐখানে বসে অপারেট করছেন অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি মাচ কো-অপারেটিভ এবং আমাদের নিজের লঞ্চটা দেন এবং কোন একটি গ্রামের উপপ্রধান তার সঙ্গে ফোন করে যোগাযোগ করে দেন।যিনি আমাদের নিয়ে যান হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সিতুলিয়া বলে এক জায়গাটার নাম, সেখানে আমরা নামলাম, নদীবাঁধ ২০ ফিট, আমি আমার দিদিমার কাছে এধরণের গল্পগুলো শুনেছিলাম।আমি অ্যাকচুয়ালি রিলেট করতে

পারছিলাম যে মাটির বাঁধ, নদীর পার, উঁচু, ওখানে গিয়ে নামলাম।পাড়ের উপরে অজস্র মানুষ মানে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ গায়ে জামা নেই, যা কিছু পরে আছেন সেগুলো শতছিন্ন প্রচন্ড নোংরা এবং খাওয়ার-দাওয়ারের কিছু নেই, ঐ আলের উপরে উনারা কেউ প্লাস্টিক টাঙিয়ে, কেউ বা শুধুই রয়েছেন, এবং আমাদের জিনিসগুলি নামানো হল, আমাদের ছেঁকে ধরা হলো, তখন যে, যার লঞ্চে গিয়াছিলাম তাদের মধ্যে অনেকে সরকারি লোক ছিলেন কারণ লঞ্চটা ডি এম এর এবং গ্রামের যেহেতু উপপ্রধান ছিলেন তিনি বলেন যে আপনারা এসেছেন একটু এগিয়ে দেখে নেন যে গ্রামটার ডিভাসটেসনের লেবেলটা কিরকম তখন আমি, আমরা ভেতরে গেলাম একটুখানি খুব সামান্য, একটা সরু এরকম একটা রাস্তা ও দুইধারে ল্যান্ডস্লাইড মাঝে নদী বইছে হয়তো ইচ্ছামতি বা নদীর তার কোন একটা পার্ট।

এবং কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে গেল এবং যখন আমরা ফিরছি তখন আমার পায়ে জলের স্রোত আসছে আর ৫ মিনিটের মধ্যে হয়তো জোয়ার আসবে আমাদের রওনা দিতে হবে এবং দেয়ার আই ফেল্ট যে গল্পগুলো আমার দ্দিমা আমাকে বলতো, বিভীষিকাটা কিরকম নিঃস্তব্ধ।আর তারপর যখন উঠে এলাম উপরে, তখন তুমি জানো এক প্যাকেট বিস্কুটের জন্য লঞ্চ এর মধ্যেই কেউ একজন ছিল সে ছুঁড়ে দিল, একটা প্যাকেট বিস্কুট ছিল অত উঁচু বাঁধের উপর থেকে ঝাপ মারছে নদীতে শুধু ঐ প্যাকেট বিস্কুট নেবে বলে কারণ তারা খেতে পাচ্ছেনা দিনের পর দিন।ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ গ্রামের উপপ্রধান যিনি তিনি বলেন জানোতো উপারটা খুলনা ফর দ্য টাইম বিয়িং আমার মনে হল খুলনায় তো আমার দিদিমার বাপের বাড়ি।

নাজমুলঃ তুমি নিজে কখনো বাংলাদেশ গেছো?

সঞ্চিতাঃ যাইনি কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে -

নাজমুলঃ কিন্তু তুমি যেভাবে প্রত্যেকটা জিনিস মানে প্রত্যেকটা জায়গাকে মানে বর্ণনা করছ, তোমার ইচ্ছে করে বাংলাদেশ যেতে তোমার পুর্ব-পুরুষদের?

সঞ্চিতাঃ ডেফিনেটলি, ইচ্ছে করে কারণ জান আমি আমার দিমার কাছে গল্প শুনেছি, যে রাত্রেবেলা ঘুমানো যাওয়ার আগে এত বৃষ্টি হয়েছে এবং নদীর থেকে জল ঢুকে, অনেক সময় বৃষ্টি না হলেও ধানক্ষেতগুলো নদী থেকে আসা জলে ভরে যেত। ফলে ধানক্ষেতের যে গাছগুলো ছিল সেগুলো জলের তলায় চলে গেছে ওরা যখন রাতে ঘুমোতে গেছেন তখন ওরা দেখেছেন যে ধানগাছগুলো জলের তলায় চলে গেছে। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছেন, তখন দেখছেন যে গাছের মাথাগুলো জলের উপরে উঠে গেছে। এটা বোধহয় বেঁচে থাকার একটা ইচ্ছা ইয়োর সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি বা দিফেন্স মেকানিজম এইটাই কি নয় যে পার্টিশনিস্ট তাদের সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি ডিফেন্স মেকানিজম একই তো রকম।

আর সবচেয়ে বড়কথা জানো তো ছোটবেলায় যে আমরা গল্পগুলো শুনি তার একটা অদ্ভুত ইমপ্যাক্ট থাকে, আমাদের মনে। এখন একটা গল্পের বই পড়লে, যেমন ধর পথের দাবী, আমার দিম্মার ফেবারিট বই বলে আমি ক্লাস ফোরে যখন পড়তাম, তখন পথের দাবী পড়েছি, বুঝতে পারিনি, অনেক কিরকম লেগেছিল, তারপর যখন ক্লাস নাইন টেন এ গিয়ে পড়লাম তখন আমি একটা অন্য পারস্পেকটিভ দেখতে পেলাম আমি আমার বড় মামার সঙ্গে আলোচনা করলাম, বড় মামা বলল তুই ওইটা কেন পড়েছিস? তুই শৈলেশের "আমি সুভাষ বলছি"পড়, সেইটা পড়লাম, পড়ার

পর আমি আমার মামিমাদিদার সঙ্গে কথা বললাম, কারণ মামিমাদিদা উনাকে দেখেছেন, সুভাষ বোসকে দেখেছেন উনারা স্বাধীনতা সংগ্রাম পার্টসিপেটন করেছেন।

এবং তারপর আমি উনাদের কাছ থেকে আরও অনেককিছু জানতে পারলাম। কাজেই তুমি একটা জিনিসকে, একটা বয়সেই যেভাবে দেখ হয়তো অন্য বয়সে সেটার ইমপ্যাক্ট অন্যরকম হয়। আমার কাছে তুমি আমার ছোটবেলার মেমরি বললে, আমি এইটা বলবো আমার গরমের ছুটি, পড়াশুনা থাকবে না, আমি মামার বাড়ি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, গাছ থেকে আম পেড়ে খাচ্ছি, আমার কাছে এইগুলো আমার ফন্ড মেমরি খুব নিজের স্মৃতিগুলি খুব কাছের, সেইটায় আমার আজকে মেইন লাইন চাইনায় দুপুরবেলা খাবার খেতে গেলে ঠিক এই ফিলিংটা আসবে না। এইগুলো ঠিক বলে বোঝানো যায়না।

এই যে তুমি বলছিলে যে স্বাধীনতা, পার্টিশনটা হবেনা, এইটা একটা টেম্পরারি বিষয়, তারপরে আল্টিমেটলি পার্টিশনটা কিন্তু হলো, পার্টিশনের পরবর্তি লাইফের কিছু গল্প যদি.....?

হ্যাঁ ডেফিনেটলি, অ্যাঃ এখানে আমার মেজোমামাদাদুর যে রোলটা সেটা খুব ইমপরট্যান্ট আমার মায়ের মেজোমামা ছিলেন শান্তিশরণ রায়চৌধুরী, তিনি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জরিত ছিলেন এবং তিনি সুভাষ বসুর সঙ্গেও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি খুলনা কলেজে পড়তেন, উনার গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার পরে, উনি যখন মানে ফুলটাইম এঙ্গেজমেন্ট উনার ছিল স্বদেশী করা এবং তখন ইংরেজ গভঃ উনাকে ধরে নেয় এবং জেলে পাঠিয়ে দেয়।

স্বাধীনতার বছর খানেক আগেই হয়তো উনি জেল থেকে ছাড়া পান এবং জেলে ধরে রাখাটা কিন্তু একটা অদ্ভুৎ ব্যাপার, কারণ দ্দিমার যিনি বাবা ছিলেন তার নাম চন্ডিচরণ রায়চৌধুরী, তিনি খুলনা টাউনে থাকতেন, তিনি বাগেরহাট এবং সেনহাটা এরিয়ার

লেন্ড লর্ড ছিলেন এবং ইংরেজ গভঃ নাকি রেললাইন তৈরী করা এবং এই সমস্তর জন্য, স্টেশন তৈরী করা এবং স্কুল কলেজ তৈরী করা, কারখানা জন্য উনার কাছে অনেক জমি নিয়েছিল, সো হি ওয়াজ এ ম্যান অফ রিসোর্স এবং উনার খুব হাই কনট্যাক্ট ছিল এবং তা সত্বেও উনার এক ছেলে বিপ্লবী ছিল, তাকে কিন্তু সরকার ট্যাপ করেছে, এবং ইংরেজ গভঃ ট্যাপ করেছে, ধরেছে, অত্যাচার করেছে। জেলে চাবুক পেটা করেছে, নখ উপড়ে নিয়েছে এবং ভদ্রলোক সারা জীবন সেই অত্যাচারের দাগ নিজের শরীরে বহন করেছে। আজীবন তিনি খাদীর পাঞ্জাবী পরেছেন, নিজের আদর্শ কখনোও ছাড়েনি। কাগজে লেখালেখি করতেন এবং পরবর্তিকালে উনি বিপ্লবি বাংলা বলে একটা র‍্যাডিকাল ম্যাগাজিনের এডিটরও ছিলেন।

কিন্তু আমি উনার আইডিওলজিগুলোর সঙ্গে খুব পরিচিত আমার স্মৃতিতে রয়েছে উনার একটা ইজি-চেয়ার, উনি সারাদিন সেই ইজি-চেয়ারে বসে হয় পড়ছেন নাহলে রাইটিং-টেবিলে বসে কিছু লিখছেন। একটা মানুষ যিনি সারাজীবন নিজের আদর্শকে সম্বল করে বেঁচেছেন, তার আইডোলজিগুলো আমি ডেফিনিটলি দেখতে চাই যে আইডিওলজিগুলোর হ্যাচিং গ্রাউন্ড। একই তো আইডোলজি আমার দাদুভায়ের আইডোলজি, আমার দিদিমার আইডিওলজি, আমার মামিমার দিদার আইডিওলজি, আমার মেজোমামাদাদুর আইডিওলজি, একি আইডিওলজি তার হ্যাচিং গ্রাউন্ড বাংলাদেশ। সেই জায়গাটা আমার একবার ঘুরে দেখে আসার ইচ্ছে আছে এবং প্রি-পার্টিশন ও পোস্ট-পার্টিশনের কথাটায় আসি, সেই প্রসঙ্গে বলতে চাই, মেজোমামাদাদু যখন জেল থেকে ছাড়া পান, উনি বাড়ি আসেন, জেলে থাকাকালিন উনার সাথে একটা ঘটনা ঘটে আমার দিদিমার যিনি বাবা তিনি মারা যান এবং তিনি যদিও খুবই ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সন এবং ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তা সত্ত্বেও ইংরেজ গভরমেন্ট কিন্তু উনার যে ছেলে জেলে বন্দি ছিল, তাকে বাবার ডেডবডি দেখতে যেতে দেয়নি, মুখাগ্নি করাতো দুরে থাক আমাদের হিন্দু রিচুয়াল অনুযায়ী। সেই অত্যাচারগুলো ছিল, যে

একজন রায়চৌধুরী টাইটেল দেখেই বুঝতে পারছ – ইংরেজদের বন্ধুলোক। তার বন্ধু মানুষের ছেলের জন্যও কিন্তু এতটা কড়া মনোভাব, তাকেও কিন্তু জেলে এইরকম ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে তাহলে যার কোনরকম কনট্যাক্ট নেই তার কি দুর্দশা ছিল?

আমার বড়মামা বলেন, আমার ফুলমামাও বলেছেন, আমার মাসিমনি বলেছেন এবং মেজোমামাদাদু মামিমাদিদাও তো বলতেন যে এই পার্টিশানটা যে হবেনা, এইটা ওদের একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল কারণ উনাদের চিরকালেই, উনাদের বলতে শুনেছি যে এরকম স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি, আমরা তো দেশভাগ মানে স্বাধীনতার মূল্যটা কি দেশভাগ? আমাদের বক্তব্য ছিল ইংরেজ গভঃ তোমরা চলে যাও, আমাদের দেশ আমাদের চালাতে দাও, তো ভাগ করে দিলে কেন? তাইনা, এবং এই ধারনাটার জন্যে এই জায়গায় আমার দাদুভাই দিদিমা কিন্তু ১৯৪৬ এ বর্তমান বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেট করেছেন, কিন্তু মেজোমামাদাদুরা, তারা কিন্তু স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশে ছিলেন।

এবং উনারা ইফ আই অ্যাম নট মিসটেকেন ১৯৪৮ এর শেষের দিকে হয়ত আসেন এবং আসেন বলাটা ভুল, আসতে বাধ্য হন। এক তো হচ্ছে তাদের যে এনসেস্ট্রাল প্রপার্টি বাগেরহাট এবং সেনহাটার যে জমি জায়গা সেগুলো কিন্তু অলরেডী এনক্রোচড হয়ে গিয়েছিল, দখল হয়ে গিয়েছিল এবং যেটা আমাকে মেজোমামাদাদু বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকার অত্যাচার করত চাবুক মারত। দেশ স্বাধীন হল পাক-আর্মি তারা কি কম করল? তারাও তো আমার বাড়িতে ঢুকছে আমার গোলা ভর্তি ধানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমার বাড়িতে বেলজিয়াম গ্লাসের বড় আয়না তাদের কোন অফিসারের পছন্দ হল খুলিয়ে নিয়ে চলে গেল, আমার বাড়ির নাটমন্দিরে ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে সেটা পছন্দ হল খুলিয়ে নিয়ে চলে গেল, আমার বাড়িটা আমার না, আমাকে আমার এক বন্ধু অফিসার এসে বলে গেল, সে পুলিশে কাজ করত, যে হিট লিস্টে

তোমার নাম আছে, তুমি যদি আর বেশিদিন থাক, তাহলে তোমার পরিবারকে মেরে দেওয়া হবে। এটা স্বাধীনতা নয়।

নাজমুলঃ পার্টিশনের অনেকদিন হল, এখন কি মনে হয়? এতদিন পরে আমারা একসঙ্গে ছিলাম, এতদিন পরেও তোমার দেশ কোথায়?

সঞ্চিতাঃ আমার দেশ ভারতবর্ষ। আই অ্যাম এন ইন্ডিয়ান বাই বার্থ এন্ড ফর্ম সোল, আমি, আই বিলং টু ইন্ডিয়া, আমার কোন সেন্স অফ বিলঙ্গিং নেই অন্য অন্য কোন দেশের সঙ্গে আই অ্যাম এন ইন্ডিয়ান বাই বার্থ এন্ড ফর্ম সোল কলকাতা আমার শহর। আমি এখানে আজন্ম রয়েছি, আমি এখানে বড় হয়েছি, এইটাই আমার জায়গা, অন্য কোন আমার জায়গা নেই। তবে হ্যাঁ তুমি যদি বাংলাদেশের কথা বল তাহলে ডেফিনিটলি কোথাও না কোথাও একটা সফট কর্ণার রয়েছে কারণ সেটা এমন একটা জায়গা যে জায়গাটা আমার দিম্মার খুব প্রিয়, যাকে আমি খুব ভালবাসি। আমার দাদুদের খুব প্রিয় যাদের আমি খুব ভালবাসি, আমি যেটা বললাম যে মাই লাভ ফর মাই এনসেশটারস সেই ভালোবাসাটাই কন্ডিশন করছে, দা ওয়ে আই ফিল ফর বাংলাদেশ, ডেফিনেটলি আমি চাইবো ওই সবুজ ধানক্ষেতের যে দৃশ্যটা, সেটা একবার নিজের চোখে দেখে আসতে, ইফ আই গিভেন অ্যান অপারচুনিটি, ডেফিনিটলি আই ওয়ান্ট টু গো।

নাজমুলঃ আমরা অনেক গল্পই তো শুনলাম। তোমার কি মনে হচ্ছে, তুমি তোমার পরবর্তি প্রজন্মকে এই গল্পগুলো পাস অন করতে চাইবে? হ্যাঁ নিশ্চয়, বা এমন কোন

সিলেকটিভ গল্প আছে যেগুলো তুমি পাস করতে চাইবে কিম্বা যেগুলো পাস করতে চাইবে না, এ রকম কিছু?

সঞ্চিতাঃ হ্যাঁ ডেফিনিটলি করব, আমার ছোটবেলার যে স্মৃতিগুলো সেই স্মৃতিগুলো, কিম্বা যে ধরনের গল্প আমি শুনেছি, সেই গল্পগুলো ডেফিনিটলি শেয়ার করব। শুধু আমার পরবর্তী প্রজন্ম কেন, আমার বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত যদি কারোর সাথে আলাপ হয়। যাদের সঙ্গে আমি আমার জীবনের কিছু ছোট ছোট কথা শেয়ার করতে পারি। কেন নয়? আমি যেটা জানি, তোমাকে বললে তো খুবই ভালো দ্যাট ইজ হাউ ওয়ে গেট টু নো ইচ আদার ইন এ বেটার ওয়ে তো সেই অর্থে ডেফিনেটলি শেয়ার করতে চাইবো।

একটা ছোট্ট ইভেন্ট আমার মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে দিম্মা বলতেন যে বাড়িতে যখন জল জমত, দেশের, গ্রামের বাড়িতে তখন কইমাছ উঠে আসত, তো একটা মজার ইভেন্ট আছে, আমারা যখন ছোট ছিলাম কালিয়ারির দেশ মামার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম সেখানে জলের খুব অসুবিধে তো বাচ্চারা যাই বলে একটা বড় চৌবাচ্চায় শিঙিমাছ, মাগুরমাছ, এদের এনে জল দিয়ে জিহিয়ে রাখা হত আর সেই মাছ ধরাটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। ঐ মাছ ধরে কেটে, ঝোল রান্না করে বাচ্চাদের খেতে দেওয়া হত।

সেই মাছ ধরতে নাজেহাল অবস্থা। মামারা পারছে না, অন্যান্য মামিরাও পারতেন না একসেপ্টটিং আমার মাসিমনি আর আমার দিদিমা মানে অলমোস্ট চোখ বন্ধ করে, এরম করে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এরম করে একটা মাছ ধরে আনতে পারতো এবং আমারা অবাক হয়ে যেতাম যে অ্যাট ওয়ান শট কিভাবে তুমি এতো সুইটলি তুলে আনছো, বলতো ওরে "আমাদের গ্রামে তো এরকম ছিল, বলে গ্রামের একটা ছোট্টগল্প"।

তাহলে কেন নয়? সেই জায়গাটা আমি কেন দেখতে চাইবো না বা আমি কাউকে সেই জায়গাটার গল্প বলবো না, এরম কেন? আর আমি একটু ছবি তুলতে ভালোবাসি। ফলে আমি যদি যাওয়ার সুযোগ পাই সেই ছবিগুলো তুলে এনে আমি আমার মাকে দেখাতে চাই, কারণ আমার মা তো আজকাল মুভ করতে পারেন না, বয়সও হয়েছে। আর আমার ফুলমামা রয়েছেন সে একজন অক্টোজেনেরিয়ান ইনফ্যাক্ট আমি যখন ফুলমামাকে বলছিলাম যে জানো তো এরকম ইনহেরিডেড মেমরি প্রজেক্ট হচ্ছে তখন ফুলমামা আমাকে বলল যে বয়স হয়েছে সবকিছু মনে রাখতে পারি না।

কিন্তু ফুলমামা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, আমাকে বলল যে তুই যদি আমায় একটু সময় দিস আর তোদের যদি প্রয়োজন পরে তাহলে যেরকম বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেই ম্যাপগুলো আমি এঁকে দিতে পারি ম্যাপ মানে ব্লু-প্রিন্ট, তার মানে সেই মানুষটার কতটা এখনো ফিলিং রয়েছে কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম ফুলমামা তুমি কী মনে করো যে তোমার দেশ বাংলাদেশ, বলল নারে ইনফেক্ট আমার দেশ বললে আমি ঝরিয়া ধানবাদের কথা মনে করি। কারণ আমি যখন এসেছিলাম তখন খুব ছোট ছিলাম, আমি এখানেই বড় হয়েছি, তবে হ্যাঁ পরে না আমার ফুলমামা এইটা বলল যে ওরা নাকি চেষ্টা করেছিল মল্লিকপুরে ফেরত যাওয়ার এটলিস্ট একবার ঘুরে দেখে আসার কিন্তু যেকোন কারণেই হোক সেটা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু আমার মেজোমামাদাদুরা মিসেস গান্ধির আমলে যখন ল্যান্ড এক্সচেঞ্জ হয় দে গট সাম কমপেনশেসন ফর দেয়ার ল্যান্ড এবং এখানেই একটা মজার ব্যাপার আছে, উই হেড শিন, উই হেড উহিটনেস এ লাভ স্টোরি, ওই ওইরকম ডামাডোলের, গন্ডগোলের বাজারে যখন রায়ট হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম হচ্ছে, সেখানে আমার মেজো মামাদাদুর সঙ্গে আমার মামিমাদিদার আলাপ হয় খুলনা কলেজে, মেজোমামাদাদু নাকি বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তাকে পুলিস ধরে জেলে চালান করে দেয় এবং মমিমাদিদা ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেস বাই দ্যাট, সেখানে সেটাই এটাই ইতি।

তারপরে তো মামিমাদিদার লেখাপড়া ওখানে শেষ করা হয়নি কারণ গন্ডগোল ছিল, বেরোতে পারছিলেন না বাড়ি থেকে নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং মামিমাদিদা, দাদারা দুজন ছিলেন, তারা আবার আমার এই মেজমামাদাদুদের সঙ্গে স্বদেশী করতেন ফলে যখন ১৯৪৮ এর পর ওনারা কলকাতায় এলেন রিপন স্ট্রিটে আমার মায়ের মামার বাড়ি আর কি, তো সেখানে ওনারা থাকলেন এবং বাই দা টাইম তার হয়তো বা পরের বছর মামিমাদিদার পরিবারও খুলনা থেকে এখানে চলে এলেন এবং তারপর মামিমাদিদা কলেজের পড়া শেষ করলেন আশুতোষ কলেজ থেকে ইউনিভারসিটিতে পড়তে গেলেন ভর্তি হলেন বাংলায় এম এ করেছিলেন তারপর উনি চাকরি করেছিলেন। উনি কলকাতায় আসার পরে সামহাও দেট কানেকশন দে গট রিজুভিনেটেড থ্রু এই স্বাধীনতা সংগ্রামি কমিউনিটি, তারা ততদিনে অনেকে তাদের মধ্যে তাম্রপত্র পেয়েছে, মানে এই অর্থে উনাদের কনট্যাক্টটা রিজুভিনেটেড হয় এবং ৫০এ, আরলি ফিফটিজে দে গট ম্যারেড, এবং ঐ সময়ে আমারা দেখেছি আমারা আমাদের বাড়িতে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার হচ্ছে আমার মায়ের মামার বাড়ি তার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে গোঁড়া বৌদ্ধ পরিবার আমার মেজো মামিমাদিদার বাড়ি।

সেটা কিন্তু ইন্টার কাষ্ট ম্যারেজ আমাদের বাড়িতে ওই সময় হচ্ছে আফটার পার্টিশন আজকের ডেটে ইনটার কাষ্ট ম্যারেজ যখন আমার বোনের বিয়ে হলে তখন কিন্তু এই প্রসঙ্গটা আমার বাড়িতে উত্থাপন হয়েছিল, মানে এখন আমরা অনেক জিনিস ওভারকাম করে উঠতে পারিনি হয়তো সেই সময়ের মানুষ ছিলেন বলেই এই মানসিকতাটা অনেক ব্রড ছিল উনাদের, মানে আমি দেখেছি যে অনেক মানুষকে সাহায্য করত এবং যেটা হয়েছিল পরবর্তী কালে একটা খুব ইনফ্লো অফ নোন পিওপল ছিল

মানে আমার মামার বাড়িতে আমি দেখেছি সব সময় কিছু গেস্ট, মানে কিছু মানে নট লেস দেন টেন টু ফিফটিন পিওপিল সব সময় কোনও না কোনও কারণে কেউ

না কেউ আসছে যাচ্ছে, এরম দুচার জনের কথা আমার মনে পরে, এক জনার আমি গল্প শুনেছি তাকে আমি চোখে দেখিনি। আমার মারা তাকে মনোরঞ্জন জেঠু বলে ডাকেন, তিনি নাকি মল্লিকপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং আমার দাদুভায়ের সিনিয়ার ছিলেন আর প্রতি দেড় দুবছর অন্তর অন্তর উনি একবার করে ঝরিয়ার বাড়িতে আসতেন কারণ উনার নিজের বাড়ির লোকেদের খাবার পছন্দ হতো না

আমার দিদিমাকে বলতেন যে, বৌমা তুমিই একমাত্র দেশের রান্না ধরে রেখেছ এই সংস্কৃতি আর কেউ তোমার মতো রান্না করতে পারে না। উনি মাস খানেক করে আমার মামার বাড়িতে এসে থাকতেন আর সব ব্যপারে উনার বক্তব্য ছিল, উনি গ্রাজুয়েট ছাড়া কারোও সাথে কথা বলতে চাইতেন না মানে ইভেন দা পারসন ইজ এন ইঞ্জিনিয়ার, উনি তাকে পছন্দ করতেন না কারণ সে গ্রাজুয়েট নয় এবং এই নিয়ে আমার মামারা প্রবল হাসাহাসি করত, মানে আমার বড়মামা গ্রাজুয়েশন পরে সারভেয়ার হয়েছিলেন। উনি ফিজিক্স পড়তেন কিন্তু যেহেতু গ্রাজুয়েট সেই মনোরঞ্জন জেঠু মায়েদের তিনি একমাত্র বড়মামার সঙ্গে পাশে বসিয়ে কথা বলতেন এবং উনি বলতেন, আমার দাদুভায়ের নাম অর্ধেন্দু, আচ্ছা ওরা, ওরা শুনি ক্রিকেট খেলা শুনে রেডিওতে কমেনট্রি, আমরাতো ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম মনে আছে। অমুক জায়গায় এই দেখতে গেছিলাম বলে সেইসব বলতে টোলতে আর যা কিছু খাবার দিত সব বলত অখাদ্য একসেপটিং আমার দিদিমা,

তো এরকম দুচারটে কথা আছে, ইভেন আমার ফুলমামা এবং আমার মনিমামা উনি সকলকে উনি হেটা করতেন তারা গ্রাজুয়েট না এবং লাস্ট যেবার উনি এসেছিলেন আমার মা তখন ডিম পাউরুটি বানাতে শিখেছিল। তো মা ঐ মনোরঞ্জন জেঠু যিনি ছিলেন তাকে ডিম পাউরুটি বানিয়ে খাইয়েছিলেন এবং ঐ জেঠু নাকি তখন বা বা তোফা তোফা করছিলেন আর বলছিলেন বউমা তুমি মেয়ে খুব ভাল ট্রেনিং দিয়েছো এবং সেইটার পর আমার দিদিমা বলেছিল বুড়ো আর বাঁচবে না, এত দূর্মুখ ছিলেন

এবং সত্যিকারেরই তারপর আর তিনি আর কখনো থাকতে আসেননি, আর একজনার কথা, দেবেনবাবু বলে -

তার কথা আমি বড়মামার মুখ থেকে আমি খুব শুনেছি তিনিও মল্লিকপুরের বাসিন্দা ছিলেন দেবেন ব্যানার্জি তার নাম ছিল তিনি ঝরিয়ার রাজার প্রতিষ্ঠা করা ইস্কুলেই পড়তেন এবং তার ইডিওসিনক্রেসি ছিল ইডিওসিনক্রেসির পর্যায় বলা উচিৎ, তিনি নাকি যেকোন বিষয়ে বক্তিতা দিতে চলে আসতেন সেই স্টার্টিং ফ্রম সোশিওলজি টু ম্যাথামেটিক্স এবং পড়াবেনই, ক্লাসে যত বেশী দুষ্টু ছেলে হোক তাকে ঐটা পড়তেই হবে, ঐ যে দেবেন বাবুর ক্লাস এবং উনি পড়াতে পড়াতে ক্লাসের শেষে কেঁদে ফেলবেন এবং ফিরে যাবেন গ্রাম বাংলায়, গ্রাম বাংলায় মানে মল্লিকপুর। ওইটাই হচ্ছে ভালো, ওখানকার পাঠশালাই হচ্ছে সেরা পাঠশালা, বাকি পৃথিবীতে কিছুই একজিষ্ট করে না এবং আমি ফুলমামা বলে যে উনি রিটায়ারমেন্টের পরে, এখানকার ঝরিয়ার আরকি সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে, টাকা পয়সা যা ছিল সমস্ত কিছু নিয়ে উনি বাংলাদেশ চলে গিয়েছিলেন এবং কোথায় গিয়েছিলেন জানা যায়না তারপর তার কেউ ট্রেস পাইনি আর একজনার গল্প আমি খুব শুনেছি তার নাম হচ্ছে লক্ষণ মামা, ভ্রদলোক ভিসুয়ালি চ্যালেঞ্জড ছিলেন, আমি যে বললাম আমার মনিমামা তিনিও ভিসুয়ালি চ্যালেঞ্জড ছিলেন। তিনি বেহালা ব্লাইন্ড বয়েস যে স্কুল ছিল সেখানে লেখাপড়া করতেন এবং সেই সূত্রেই লক্ষণ মামার সঙ্গে তার আলাপ

লক্ষণ মামার পরিবার কিন্তু পার্টিশন হিট ছিল তারা ১৯৪৭ পর কোন একটা সময়ে কলকাতা আসেন এবং যেহেতু তিনি ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জড ছিলেন তার বাড়ির লোকেই হোক বা পাড়ার লোকেই হোক তারা লক্ষণ মামাকে ওই বেহালার স্কুলে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় এবং আজীবনে তার কোনদিন খবর নিতে আসেনি। তো লক্ষণ মামাকে

বোধহয় ষোল সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে রেখেছিল এবং তারপরে তাকে কিছু কাজ দিয়েছিল, কারণ তিনি খুব ভাল, নানান রকম বাদ্য যন্ত্র বাজাতে জানতেন, মানে সারেঙ্গি এসরাজ, বেহালা নানান ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে জানতেন এবং স্কুলের ছেলেদের বাজনা শেখাতেন কিন্তু একটা সময়ের পর নাকি উনাকে আর স্কুলে একমোডেট করা সম্ভব হয়নি, তো তখন কমিউনিকেশন নাকি প্রবলেম ছিল এমন তো ফোনটোন তো ছিলনা, তো লক্ষণ মামার গল্পটা এরকম যে আমার দাদুভাই যেদিন পুজোর ছুটি পড়ছে ঝরিয়াতেখুব ভাল দুর্গাপুজা হয়, প্রচুর বাঙ্গালি রয়েছে তো যেদিন উনি আসছেন, ছুটির দিন নিচে থেকেও একজন পিয়ন বা কেউ এসে দারওয়ানজি খবর দিয়েছেন যে আপনার ছেলে দেখা করতে এসেছে তো দাদুভাই ভাবছে যে আমার ছেলেতো বাড়িতে রয়েছে, সেতো পুজোর ছুটি বলে অলরেডি ঝরিয়া চলে এসেছে, তো দাদুভাই যখন খবর পেলেন যে নিচে ছেলে এসেছে তখন উনি দেখা করতে গেলেন, দেখছেন একজন অপরিচিত মানুষ, তিনি বসে আছেন, সাথে একটা পুটলি রয়েছে বেহালার বাক্স রয়েছে আর কী কী সব। মানে ওই বাদ্যযন্ত্র একটা দুটো আর একটা পুঁটলি। তো দাদুভাই জিজ্ঞেস করলেন তাকে যে তুমি কে? কী ব্যাপার?

তখন বলল যে, লক্ষনমামা নাকি বলেছে আপনি কি কমলের বাবা? কমল আমার মামা, যে মামার কথা বলছি তার ভাল নাম কমলেন্দুশেখর ভট্টাচার্জ্য। তুমি কি, আপনি কি কমলের বাবা? তখন দাদুভাই বলেছে হ্যাঁ, তখন সে আর কি দাদুভায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলেছে বাবা আমি লক্ষন আমার কেউ নেই। তুমি আমার বাবা, তো সেইদিন দাদুভাই ওই লক্ষনমামার হাত ধরে বাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলেন এবং আমৃতু লক্ষনমামা আমার মামারবাড়িতেই ছিল এবং তাকে আমার মারা, মাসিরা ভাত মেখে দিত, সে মাছের কাঁটা না বেছে দিলে খেতে পারতনা, সে কাটা আমার দিদিমা বেছে দিত। আজীবন সে ওখানে ছিল।

আর একজনের কথা আমার খুব মনে পরে তার নাম ঝর্ণা আন্টি। ঝর্ণা আন্টির সঙ্গে আমাদের পারিবারিক পরিচিতি, মানে আমার কাকা, জেঠু এদের তরফে পরিচিতি। ঝর্ণা আন্টি বেসিকালি বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, হয়তো বরিসাল বাএরম কোন অঞ্চল থেকে এবং খুব কষ্ট করে ঝর্ণা আন্টির বাবা উনার দাদাকে নিয়ে বর্ডার ক্রস করে কলকাতাই এসে পরে এবং আমি ঝরনা আনটির কাছ থেকে শুনেছি এবং ওর বাবাকে আমি একবারই দেখেছি।

ভদ্রলোক ডিমেনশিয়ার পেসন্ট ছিলেন এবং উনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন বিড়বিড় করতেন এইটুকু মনেআছে, ছোটবেলায়। তো উনার, উনি যাদবপুরের কোন একটা অঞ্চলে এসে বাড়ি নিয়েছিলেন। উনার কাছে উনার যা এসেট ছিল সে গুলোকে উনি টাকায় কনর্ভাট করে এনেছিলেন আসার আগে, বড় নোট মানে ১০০টাকা হোক, ৫০০টাকার নোট ছিল কিনা জানিনা, মানে উনারা বলেন বড়নোট। বড়নোট মানে কি নোট আমার জানা নেই, তো সেই বড়নোট নিয়ে উনি কলকাতায় আসে এবং যাদবপুর চত্বরে কোথাও উনি থাকেন। এবং উনি নাকি সেই নোটগুলো তোশকের মধ্যে বালিশের মধ্যে বান্ডিল করে রেখেছিলেন, যে সময় সুযোগ বুঝে সেটাকে ব্যাংক কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে বা কিছু করা যাবে ব্যবস্থা করা যাবে এবং রাতারাতি সেই নোটগুলো ব্যান্ড হয়ে গিয়েছিলো এবং সেই খবরটা উনি পাননি, যখন জানতে পারলেন যে সেই নোটগুলো বাতিল হয়ে গেছে তখন ভদ্রলোক পাগল হয়ে যান মানে পুরাপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং সারাদিন লেমেন্ট করতেন যে আমার সব গেল এবং আমি ঝর্ণা আন্টির কাছ থেকে এই একটা জিনিস শুনেছি।

আর একজনের, আর জনের আমার ফেমিলি ফ্রেন্ড, তিনি, আমার মা তাকে দিদি বলে ডাকেন তার নাম অমিতাদি, ভদ্রমহিলা এখন আর নেই, তিনি একসময় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কাজ করতেন আর ইভিনিংএ আমাদের কলকতা ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরি সায়েন্স পড়তেন। আমার মাও ঝরিয়া থেকে একসময় ঝরিয়া থেকে

কলকাতায় আসেন এবং একই ক্লাসে দুইজনে পড়তেন, তো যখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে এই '৭০ এই সময়টা, এসময়টা, প্রচুর আবার সেই দেখা যায় বহু মানুষ বর্ডার পার করে এইখানে আসে এবং সেইসময়ে ত্রান বা সাহায্য চাওয়া হচ্ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তো মায়ের কাছে ব্যাগে যেটুকু পয়সা ছিল, মা নাকি বার করে দিয়ে দিয়েছিল কারণ মায়ের বক্তব্য ছিল আমার বাবার দেশেরমুক্তি-সংগ্রাম হচ্ছে এবং সেই অমিতাদির ফিউরিয়াস রিঅ্যাকশান ছিল এবং পরে আমি গল্প শুনেছিলাম যে অমিতাদিরা ঢাকায় খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ ছিলেন এবং রাতারাতি উনাদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়।

আসার সময় পাড়াপ্রতিবেশিদের একটা দল আর কি কোন জায়গা দিয়ে আসছিল এবং উনি দলছুট হয়ে যান, দলছুট হয়ে যান, পাড়ার কোন আর একজনার সঙ্গে উনি থাকেন কিন্তু উনার মাবাবার থেকে উনি আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তারপর সেখান থেকে মাঠ পার হয়ে একট জায়গায় রাত্রিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন সকালে উঠে নাকি দেখেছিলেন যেখানটায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেপাঁচিল বা ভাঙ্গাবাড়ির কোনঅংশ এবং চতুর্দিকে রক্তেরদাগ এবং ট্রমা মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। হেঁটে নদী পার হয়েছেন যারা বাড়ির গাড়িতে করে রাস্তায় বেরতো সেইসময়ে বাড়িতে গাড়ি থাকাটা একটা বিশাল ব্যাপার ছিল তার কাছ থেকে ঐভাবে কষ্ট করে এসে যাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে তাদের বাড়িতে নাকি একটা সিঁড়ির নিচে চৌবাচ্চার পাশের কিছুটা অংশে উনাকে অ্যালট করা হয়েছিল। কারণ তার গোটা বাড়িটাতে ঐরকম ৬০/৭০জন পরিচিত লোক এসে অলরেডি রয়েছে এবং উনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, বাঁচারই কোন আশা ছিলনা।

কিন্তু কোনভাবে সৌভাগ্যক্রমে উনার বাবা মা উনার ট্রেস পান এবং তারপর উনাকে নিয়ে যান এবং তার পর উনারা প্রচন্ড স্ট্রাগল করেছেন। মানে উনাদের শিক্ষাই সম্বল ছিল এবং তারপর উনারা কাটিয়ে উঠলেন। সেইজন্য ঐ অমিতাদির বক্তব্যটাও আমি

ছোটবেলায় শুনেছি যে মুক্তিসংগ্রামে টাকা দেওয়াতো দূরে থাক, আমি ত্রানেও টাকা দেবনা। যারা আমাদের সব কিছু নিয়ে নিয়েছে তার দেশে বন্যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মানে এইটাও, এইটাও কিন্তু আমি দেখেছি। এই রিঅ্যাকশানটাও আমি দেখেছি।

কিন্তু আমি জানিনা কিভাবে এইগুলো এক্সপ্লেন করা যেতে পারে বা আদৌ এক্সপ্লেন করা যেতে পারে কিনা। কিন্তু সবটাই আমরা কিভাবে দেখছি তার উপর ডিপেন্ড করছে।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved